

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কার্যত বাড়েনি

রাশেদা কে চৌধুরী

● সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রোকেয়া রহমান

প্রথম আলো ● এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন? অর্থমন্ত্রীর দাবি, শিক্ষা খাতে ১ হাজার ৪২২ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

রাশেদা কে চৌধুরী ● হ্যাঁ, আমাদের কাছেও প্রথমে মনে হয়েছিল শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়—এ দুই মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কমেছে। এভাবে বরাদ্দ কমার ফলে শিক্ষায় আমাদের অর্জন ঝুঁকির মুখে পড়বে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এবার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। এতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে বরাদ্দ অনেক বেশি। কিন্তু সঠিক চিত্র তা নয়।

প্রথম আলো ● শিক্ষা খাতে জিডিপি ৬ শতাংশ বরাদ্দের দাবি ছিল। কিন্তু বরাদ্দ করা হয়েছে ২ দশমিক ৭ শতাংশ। অথচ মালয়েশিয়ায় জিডিপি ৬ দশমিক ২ শতাংশ, মালদ্বীপে ৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৬ দশমিক ২ শতাংশ বরাদ্দ হয়ে থাকে। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

রাশেদা কে চৌধুরী ● বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, অর্থাৎ এসডিজির লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। যেখানে বলা হয়েছে, শিক্ষা খাতে জিডিপির ন্যূনতম ৪ শতাংশ বরাদ্দ দিতে হবে। অথচ সেখানে জিডিপি ৩ শতাংশও বরাদ্দ করা হয়নি। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। এটা জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়। যেখানে বলা হয়েছিল, ২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষায় বিনিয়োগ জিডিপির ৪ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

প্রথম আলো ● শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ হয়, তার বেশির ভাগই ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অবকাঠামোর উন্নয়নে, এটা সরকারের শিক্ষাবিরোধী নীতি কি না?

রাশেদা কে চৌধুরী ● না, এটাকে আমি শিক্ষাবিরোধী নীতি বলব না। শিক্ষকদের যথোপযুক্ত বেতন-ভাতা-মর্যাদা অবশ্যই চাই। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্মত শিক্ষক ও অবকাঠামো দরকার। আমাদের দেশে যদিও বেশ দুর্বল সেটা হচ্ছে শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। আমাদের শিক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে। অথচ এ বিষয়ে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। অথবা দেওয়া হলেও শিক্ষকেরা প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছেন না। প্রথমটি হচ্ছে মূলধারা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যম এবং তৃতীয়টি হচ্ছে মাদ্রাসাশিক্ষা। মূলধারার শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। একটা সরকারি, আরেকটি বেসরকারি। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ন্যূনতম নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবস্থাপনার দিকটি মোটামুটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে। শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি মোটামুটি নিয়মমাফিক হয়ে থাকে। কিন্তু মাধ্যমিকে ঠিক



এর উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে ৯৭ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-বাণিজ্য, ভর্তি-বাণিজ্য, টেন্ডার-বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে জনমনে অসন্তোষ আছে। পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো না থাকায় এসব দুর্নীতির লাগাম টানা সত্ত্ব হচ্ছে না। এ জন্য আমরা স্বতন্ত্র একটি 'সমন্বিত শিক্ষা আইন' চেয়েছিলাম। সরকার এ ব্যাপারে কিছুটা এগিয়েছে। আশা করছি, দ্রুত একটি যুগোপযোগী শিক্ষা আইন প্রণীত হবে।

প্রথম আলো ● ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। সাত বছর পর আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

রাশেদা কে চৌধুরী ● ২০১০ সালে আমরা খুব ভালো একটি শিক্ষানীতি পেয়েছিলাম। ২০১৮ সালের মধ্যে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা ছিল। সাত বছর পর এ ব্যাপারে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা খাতে জিডিপি ৪ শতাংশ বরাদ্দ করার কথা ছিল। আগেই বলেছি, তা পূরণ হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার কথা ছিল, হয়নি। সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ স্টাডিজসহ ন্যূনতম কতগুলো পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল। হয়নি। সম্প্রতি আদালতের একটি নির্দেশনার মাধ্যমে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে বাংলাদেশ স্টাডিজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা পারলে ধর্মীয় মাধ্যমে অসুবিধা কোথায়? একটি দেশে নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকবে অথচ তাদের সব কটির ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিয়মতান্ত্রিকতা থাকবে না—এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম আলো ● সম্প্রতি হেফাজতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যবই থেকে অনেক রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা কি মৌলবাদী শক্তির কাছে সরকারের আত্মসমর্পণ নয়?

রাশেদা কে চৌধুরী ● হেফাজতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। হঠাৎ করে আমরা দেখলাম, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ থেকে সরে গিয়ে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০১৬ সালের ৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে প্রকাশ্যভাবে হেফাজত যেসব দাবি জানিয়েছিল, পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। যে রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের পরিচালিত সরকার এই পরিবর্তন আনল—এটা খুবই দুঃখজনক। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়নি, তাদের প্রতি সরকারের নমনীয়তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

প্রথম আলো ● আপনাকে ধন্যবাদ।

রাশেদা কে চৌধুরী ● ধন্যবাদ।